অধ্যায় ১৩: অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ , সুশীল সমাজ , স্বার্থগোষ্ঠী ও এনজিও

প্রশ্নঃ সুশীল সমাজ বলতে কী বোঝেন? এনজিও ও সুশীল সমাজের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজ হল একটি সংগঠিত গোষ্ঠী, যার সদস্যরা সরকারের কাছ থেকে নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রিত হয়। সুশীল সমাজ ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সুশীল সমাজ কখনও কখনও সরকার ও জনগণের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকেই প্রত্যয়টিকে নাগরিক সমাজ, জনসমাজ, লোকসমাজ, বেসামরিক সমাজ ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকেন।

সুশীল সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে–

- বেসরকারি সংস্থাসমূহ,
- পেশাজীবী সংস্থাসমূহ,
- ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ,
- আইনজীবী সংগঠনসমূহ এবং
- ব্যক্তি মালিকানাধীন গণমাধ্যমসমূহ ।

বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো তাঁর Social Contract গ্রন্থে সর্বপ্রথম Civil Society প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। সর্বসাধারণের উন্নতি বিধান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সুশাসন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে স্বাধীনভাবে অথবা সরকারের সহযোগিতায় সুশীল সমাজ অংশগ্রহণ করে থাকে। সুশীল সমাজ এক ধরনের চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

বলা হয়ে থাকে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা কিংবা প্রভাব যেখানে শেষ সেখানেই সুশীল সমাজের শুরু।

এনজিও(NGO)

সাধারণ অর্থে এনজিও বলতে বোঝানো হয় সেইসব সংস্থাকে যেগুলো উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে।

NGO এর পূর্ণরূপ হলো Non Governmental Organization, যার অর্থ বেসরকারি সংস্থা। বেসরকারি সংস্থা বলতে বোঝানো হয় সেসব সংস্থাকে যেগুলো উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। সহজ অর্থে বেসরকারি সংস্থা বলতে কোনো অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বোঝায়, যা উন্নয়ন সহযোগিতা অথবা শিক্ষা ও নীতিগত কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকে।

জাতিসংঘ (UN) - এর মতে,

যেকোনো বেসরকারি সংগঠন যা সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে, তাকে NGO বলে। সেখানে মুনাফাবিহীন, সন্ত্রাসবিহীন এবং অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক NGO-কে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে-

'NGO's as institutions outside the public and private sectors whose goals are primarily value-driven (humanitarian or co - operative) rather than profit driven.'

এনজিও ও সুশীল সমাজের মধ্যে পার্থক্য

এনজিও	সুশীল সমাজ
মানবতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জনসাধারণের নীতি, সামাজিক, মানবাধিকার, পরিবেশগত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী পরিবর্তনে নিয়োজিত।	সর্বসাধারণের উন্নতি বিধান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সুশাসন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে স্বাধীনভাবে অথবা সরকারের সহযোগিতায় সুশীল সমাজ অংশগ্রহণ করে থাকে।
এসব সংস্থা বেসরকারি হলেও সরকারি অনুমোদন নিয়েই এরা কাজ করে।	সুশীল সমাজের সরকারি অনুমোদনের কোন প্রয়োজন নেই।
সরকার গৃহীত পরিকল্পনা নীতির সাথে সম্পর্কিতভাবে বা সরকার নির্দেশিত পথে এদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।	সরকারের নীতি ও আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে।
বেশিরভাগ বেসরকারি সংস্থাই বিদেশি সাহায্য দাতাদের নিকট দায়বদ্ধ, উপকারভোগীদের প্রতি নয়।	অপরদিকে সুশীল সমাজ দেশের নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ।
সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।	সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে জনগণকে সম্পৃক্ত করে।
সাধারণত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মতামত ব্যক্ত করে না।	সুশীল সমাজ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে।
সরকার ও জনগণের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিরসণে সরাসরি কোন ভূমিকা পালন করে না ।	সুশীল সমাজ কখনও কখনও সরকার ও জনগণের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
এনজিওগুলো অলাভজনক সংস্থা হলেও কর্মরত লোকজন বেতনভুক্ত।	সুশীল সমাজ অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া স্বেচ্ছায় কাজ করে ।

প্রশ্নঃ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী? সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে লিখুন।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী:

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের ভিত্তিতেই পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। এরা এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য:

১. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার;
২. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বেসরকারি ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে গঠিত
৩. সরকার কাঠামোর বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চায়
৪. প্রয়োজনবোধে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মিটিং, মিছিল, শোভাযাত্রার মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে;
৫. সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকাঃ

০১) সরকারের নীতি ও আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে;
০২) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে;
০৩) রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে;
০৪) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে;
০৫) রাজনৈতিক প্রচার-প্রসার সংগঠিত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে;
০৬) সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে;
০৭) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরাসরি বক্তৃতা, মিছিল-মিটিং, পুস্তিকা প্রকাশ, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন কিংবা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে সরকারকে তথ্য সরবরাহ করে থাকে;
০৮) সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে, সরকারের নীতি অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী হলে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে সরকারকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পালনে বাধ্য করে।

প্রশ্ন: জনমত গঠনে সুশীল সমাজের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

একটি দেশের সুশীল সমাজকে বিবেচনা করা হয় সমাজের চালক হিসেবে আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করা। জনগণের কল্যাণ সাধনে সিভিল সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের দাবী দাওয়া সরকারের নিকট পৌছাতে সিভিল সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনমত গঠনে সুশীল সমাজের ভূমিকা:

জনসাধারণের মতই হলো জনমত । জনগণ যখন কোন একটি সাধারণ বা বিশেষ বিষয়ে মত পোষণ. করে তখন তাকে জনমত বলে। জনমত গঠনে সুশীল সমাজের ভূমিকা নিম্ন উল্লেখ করা হলো -

১. **Watch dog:**
   সুশীল সমাজ Watch dog বা পাহারাদারের ভূমিকা পালন করে, কোথাও সুশাসনের ঘাটতি দেখা গেলে বা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে সে বিষয়ে প্রতিবাদ করে।
২. **জনমত সম্পর্কে সচেতনতা:**
   সুশীল সমাজ একদিকে যেমন নাগরিকদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে, অপরদিকে সরকারকে বাস্তব পরিস্থিতি ও জনমত সম্পর্কে সচেতন করতেও ভূমিকা পালন করে।
৩. **জনমত গঠন:**
   সুশীল সমাজ সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। দেশের নাগরিকদের চাহিদা, প্রয়োজন এবং দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরে সুশীল সমাজ। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অধিকার সচেতনতা তৈরি হয় এবং জনমত গড়ে উঠে।
৪. **মানবাধিকার রক্ষা:**
   দেশের কোথাও কোনো ধরনের মানবাধিকারের লঙ্ঘন হলে সিভিল সোসাইটি তা তুলে ধরে এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে।
৫. **ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা:**
   ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে স্বাধীন ও সুস্থ রাখার চেষ্টা করে সিভিল সোসাইটি। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে সমাজে এক ধরনের জনমত গঠন করতে সাহায্য করে সিভিল সোসাইটি।
৬. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা:**
   দুর্নীতি মোকাবিলায় জনমত গঠন করে সিভিল সোসাইটি। এতে করে সরকার দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।

৭. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চাপ সৃষ্টি:**

বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ন্যায় বিচার নিশ্চিতকল্পে আইনের শাসনের বিকল্প নেই কিন্তু সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার বা আইনের শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও সংগঠিত নয়। সুশীল সমাজ এ জায়গাটি পূরণ করে।

৮. **অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান:**

সুশীল সমাজ মানুষকে সহনশীল হতে শেখায় এবং জনমত গঠন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওর ভূমিকা আলোচনা করুন।

০১. মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ পুনর্গঠনে অবদান

০২. আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান

প্রাথমিকভাবে এনজিওগুলো তাদের কাজ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও পরবর্তীকালে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়োনিষ্কাশন, নারীর ক্ষমতায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে এক ধরনের নীরব ভূমিকা পালনে করে আসছে দেশের এনজিও।

০৩. আর্থসামাজিক সূচকগুলোয় এগিয়ে থাকায় অবদান:

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারতের চেয়েও বাংলাদেশ আর্থসামাজিক সূচকগুলোয় অনেকাংশে এগিয়ে আছে। এক্ষেত্রে এনজিও ও সরকারের নানা নীতি ও কৌশলের অবদান রয়েছে। তবে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে দেশের এনজিওগুলো।

০৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল মানুষের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অবদান:

০৫. কৃষি খাতে অবদান:

বাংলাদেশের জন্মলগ্নে যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত ভেঙে পড়া অর্থনীতি নিয়ে দেশ দাঁড়িয়ে ছিল, তখন সেই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর মূল হাতিয়ার ছিল বাংলাদেশের কৃষি খাত। সরকারি কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি এনজিও প্রতিষ্ঠান কৃষি খাতকে উন্নত করার জন্য আধুনিক চাষ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ, কৃষিঋণ প্রদান, উন্নত মানের বীজ ও সার সরবরাহ, কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা প্রদানসহ নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে গ্রাম ও কৃষি অঞ্চলগুলোয় বেকারত্বের হার কমে পরিবারগুলোয় আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে। এছাড়া পশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার, মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতিপালন ও চাষ পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এবং বাজারজাতের কৌশল সম্পর্কে অবগত করে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করে চলেছে।

০৬. শিক্ষিত জাতি গঠনে অবদান:

নিরক্ষরতার হার কমিয়ে প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকারি উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য হারে দেশের সাক্ষরতার হার বাড়িয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্র ও অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধ শ্রেণীর নিরক্ষর জনগণের জন্য অক্ষরজ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা এবং নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য নারীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর এনজিও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিবিএসের রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৬.৮ শতাংশ। শিশু শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, জেন্ডার শিক্ষা ইত্যাদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিওরা নিরলসভাবে কাজ করেছে। দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে যেসব জায়গায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে শিশুদের ও বয়স্কদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে এনজিওরা।

০৭. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশে এনজিওগুলো:

সারা বিশ্বে শরণার্থীদের পাশে থাকে এনজিওগুলো। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। ২০১৭ সাল মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এ দেশে আশ্রয় নেওয়ার পর দেশি ও বিদেশি অনেক এনজিও তাদের পাশে দাঁড়ায়। এখনো বেশ কিছু এনজিও কক্সবাজারের বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবিরে নানা ধরনের সেবা দিয়ে চলেছে।

০৮. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান

সুস্থ জনগণই সবল অর্থনীতির চালিকাশক্তি। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র শ্রেণীর জনগণের সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, কেয়ার বাংলাদেশসহ বেশকিছু এনজিও স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষাসামগ্রী, সাশ্রয়ী মূল্যে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। সরকারের সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচিতে জনসম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করেছে এনজিওরা। টিকা নেয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুদের সচেতন করে টিকা কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন এনজিও কর্মীরা।

০৯. কর্মসংস্থান তৈরিতে অবদান

বিবিএসের সাম্প্রতিক উপাত্তে দেখা যায় যে, ৮৭% কর্মসংস্থান বর্তমানে সৃষ্টি হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায়। অন্যদিকে ১৩% কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে। প্রায় তিন হাজারের মতো এনজিও বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কাজ করে চলেছে।

১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা

১১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি

শত শত নারী পুরুষকে গবাদিপশু, হাঁস মুরগির টিকাদান ও চিকিৎসা, বৃক্ষ-নার্সারী প্রভৃতি, শিক্ষা ও ঋণ দান করে দারিদ্র বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

১২. রোহিঙ্গা পুনর্বাসনে ভূমিকা:

পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জরুরি মানবিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে এনজিওগুলো সরকারের নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী ও সমন্বয়পূর্বক ব্যাপক আকারে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ করে যাচ্ছে।

১৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানবিক উন্নয়ন, ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর সম্পর্কে, শোষণ ও আধিপত্য সম্পর্কে বিষয়ে বিশ্লেষণমূখী জ্ঞানার্জনে সহায়তার মাধ্যমে মানুষের নিজের করণীয় আবিষ্কার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যকর ভাবে উদ্যোগী করে তোলে। ।

১৪. এসিড নির্মুল

এক সময় দেশে এসিড সন্ত্রাস বেশ আলোচিত ছিলো ।দেশের বিভিন্ন এনজিওর সহযোগিতায় এসিডের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন ও এসিড সন্ত্রাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, আইনগত সহযোগিতা ও পূনর্বাসনের ব্যবস্থায় সহযোগিতা করেছে এনজিওগুলো ।

১৫. ডায়রিয়া প্রতিরোধে ভূমিকা:

'এক মুঠো গুড়, তিন আঙুলের ডগা দিয়ে এক চিমটি লবণ ও আধা লিটার বিশুদ্ধ পানি'- এই স্লোগাননিয়ে এনজিও কর্মীরা প্রতিটি ঘরে ঘরে স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং ব্যবহার নিয়ম পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের কাছে।

১৬. নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত

১৭. এসডিজি অর্জনে ভূমিকা

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের সব সূচকে অগ্রগতি অর্জন করেছে।টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১৮. গণসচেতনতা বৃদ্ধি

১৯. অবকাঠামোগত উন্নয়ন

২০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা

❖ নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওর ভূমিকা

০১. নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা:

নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে দারিদ্র্যবিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান তৈরি, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো। তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের সুসংগঠিত করে দল গঠনের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও নারী নেত্রীরা।

০২. নারী শিক্ষার বিকাশ :

বিভিন্ন NGO তার সুবিধাভোগী নারীদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার ব্যাপারে নানামুখী পদক্ষেপ পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া এ সকল মায়ের সন্তানদের সুশিক্ষায়ও এই সকল NGO সহযোগিতা করায় দেশে শিক্ষার বিকাশ ঘটে।

০৩. কুসংস্কার দূরীকরণ :

বাংলাদেশের গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষ প্রচণ্ড কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা নানা প্রাকৃতিক অপশক্তিসহ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে। আর অধিকাংশ সময় তার শিকার হতে হয় নারীদের। বর্তমানে বিভিন্ন ঘএঙ গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান- প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে এই কুসংস্কার দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

০৪. ক্ষুদ্রঋণ :

নারীদের ক্ষমতায়নে বিভিন্ন NGO সংস্থা যে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু করেছে তা নারীদের কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে। ফলে তারা পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনে সাহায্যদানের মাধ্যমে পরিবারে নিজের আলাদা একটা গুরুত্ব তৈরী করতে পারছে।

০৫. নারী নির্যাতন হ্রাস :

NGO গুলোর ব্যাপক ও বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে নারী নির্যাতন অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা নারী নির্যাতনের হার অনেক কমিয়ে এনেছে।

প্রশ্ন: নেতৃত্ব কী?

ইংরেজি Leadership শব্দের অর্থ নেতৃত্ব, Leader শব্দের অর্থ নেতা। Leadership শব্দটি এসেছে ইংরেজি Lead থেকে। Lead শব্দের অর্থ চালনা করা, নির্দেশ প্রদান করা এবং পথ দেখানো। যে ব্যক্তি নির্দেশ প্রদান করেন, সামনে থেকে সবকিছু পরিচালনা করেন তাকে নেতা বা Leader বলে। আর নেতার যোগ্যতা বা গুণাবলিকে নেতৃত্ব বলে।

সাধারণত নেতৃত্ব বলতে নেতার গুণাগুণকে বোঝায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'নেতৃত্ব' শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক। কোনো ব্যক্তি বা কোনো দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যাকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে সেই গুণকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব সামাজিক গুণ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

- এইচ. ও. ডানেল (H.O. Dunel) বলেন,
  "সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে প্ররোচিত ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলা হয়।"
- এলভিন ডব্লিউ গুল্ডনার (A.W. Gouldner)-এর মতে,
  'নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি, যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে"
- কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) নেতৃত্বের সংজ্ঞায় বলেন,
  'নেতৃত্ব হলো ব্যাক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মধারা প্রভাবিত করে এবং সবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে'।
- সি. আই. বার্নার্ড (C. I. Bernard) বলেন,
  'নেতৃত্ব হলো ব্যক্তিমণ্ডলীর এমন গুণাবলির সমষ্টি, যার মাধ্যমে তারা সংগঠিত কর্মোদ্যোগে জনগণের অথবা তাদের কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে'।

পরিশেষে বলতে পারি যে, নেতৃত্ব ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তির সেই ব্যক্তির সেই কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত গুণ বা গুণাবলি, যা সমাজের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত করে।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ক্যারিশমাটিক' নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব: ধর্মীয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র যে ঠিক ছিল না তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষণ, বঞ্চণা ও লাঞ্ছনা। আর এ থেকে মুক্তির জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তোলান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিচে বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচন করা হলো:

১. **বাবার আদেশ মান্য:**
অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু তার বাবার আদেশ মেনে অন্যায়ের প্রতিবাদকারী হন।

২. **সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য:**
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ক্যারিশমাটিক নেতৃত্বের একটি বিশেষ গুণ ছিল তাঁর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধুর প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, আজ হোক কাল হোক বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বঙ্গবন্ধুর দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল–প্রথমটি, বাংলাদেশের স্বাধীনত অর্জন দ্বিতীয়টি, আওয়ামী লীগকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের পরাজিত করে আওয়ামী লীগের ব্যানারে ক্ষমতায় গিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

৩. **আপসহীন:**
বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশমাটিক নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না এবং নীতির প্রশ্নে আপস করতেন না। এ জন্য তাকে বারবার পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারাগারে যেতে হয়েছে এবং সহ্য করতে হয়েছে সীমাহীন অত্যাচার ও নিপীড়ণ। তিনি ছিলেন অনন্য এক বিদ্রোহী সত্তার অধিকারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক চরমপত্র দেয়। তাকেসহ ৫ জনকে ১৫ টাকা জরিমান দিয়ে এবং অভিভাবক মারফত মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্ব রক্ষার জন্য বলা হয়। আজন্ম প্রতিবাদী ও আপসহীন বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে সরে না আসায় ১৯৪৯ সালের ১৮ এপ্রিল তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হিসেবে বহিষ্কার করা হয়।

৪. **প্রভার বিস্তারকারী ভাষণ:**
বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার ভাষণের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল বঙ্গবন্ধুর, যা প্রায়ই উপভোগ্য হিসেবে স্মৃতিতে জেগে ওঠে। ব্রিটিশ সাংবাদিক স্যার মার্ক টালির মতে, তাঁর বক্তব্য খুবই চমকপ্রদ, যা জনতাকে ব্যাপকভাবে সম্মোহিত করত এবং তাঁর বক্তব্য ছিল স্মৃতিসুরভিত বজ্র। তিনি তাঁর সম্মোহনী ও অত্যুৎসাহী বক্তব্যের মাধ্যমে জনগনকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ কণ্ঠের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শক্তিশালী ভাষণ পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক মসনদকে ভেঙ্গে তছনছ করেছিল, যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অধিক শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত। তাঁর জ্বলন্ত আর উত্তপ্ত বাগ্মিতার মাধ্যমেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর UNESCO ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

৫. **অসাধারণ ব্যক্তিত্বঃ**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। ভারতের ঝাড়খণ্ড ও মনিপুরের সাবেক গভর্নর ভেড মারওয়াহ তার ব্যক্তিত্ব সম্পংকে বলেন, 'আমি আমার চাকরিজীবনে জওহারলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীসহ ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্বের অনেক নেতা দেখেছি কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হয়েছি যে, তাদের মধ্যে সর্বাধিক ক্যারিশমাটিক নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' কিউবার মহান নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেন,

'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় এই মানুষটি হিমালয়ের সমতুল্য। আর এভাবেই আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।'

৬. **মেধাবী সংগঠকঃ** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সক্ষমতা ছিল চমৎকার। তাঁর ছিল ধৈর্য্য ও নমনীয়তা, যা দেশে আওয়ামী লীগকে সর্বাধিক শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে তুলতে খুবই দরকার ছিল। তিনি সমন্বয়ক হিসেবেও ছিলেন চতুর ও প্রতিভাবান। দৃঢ় মানসিকতা, সমন্বিত মেধা ও সদাচরণের মাধ্যমে তিনি ক্যারিশমাটি নেতা হিসেবে নিজেকে একজন ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৭. **আত্মবিশ্বাস ও সাহসঃ** বঙ্গবন্ধু ছিলেন আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ একজন মহান নেতা। এ কারণে তিনি একসময় ছয়-দফাকে এক-দফায় পরিণত করতে সক্ষম হন। এটা ছিল তাঁর স্বপ্ন তথা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসীম সাহসিকতার আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৬৯ সারের ৫ ডিসেম্বর এক জনসভায় তিনি ঘোষণা দেন, পূর্ব পাকিস্তান হবে বাংলাদেশ এবং তাঁর এই ঘোষণা সারাদেশে বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও শংকা তৈরি করে। তারা বঙ্গবন্ধুকে প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে আখ্যা দেয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন , নিপীড়ন, বৈষম্য, অত্যাচার প্রভৃতির মুখে দেশকে স্বাধীন করার মিশন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হননি।

৮. **জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও মানবিকতাঃ**

বঙ্গবন্ধু প্রতিটি মানুষকে বিশেষত বঞ্চিত, দুঃস্থ, গরিব, অসহায়দেরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি সর্বদা সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে, অসহায় ও দুঃস্তা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে নিজেকে উজাড় করে দিতেন এবং এর মাঝেই তিনি অনাবিল আনন্দ আর তৃপ্তি খুঁজে পেতেন। একজন সফল জননেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবতাবাদের প্রতীক। তিনি যেখানেই অন্যায়, অবিচার, শোষণ দেখেছেন তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এজন্য তাঁকে বারবার শাসকগোষ্ঠীর কড়া শাসনে পড়তে হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের অর্ধেক সময় তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। তুবও তিনি ছিলেন অনড়, দৃঢ়।

৯. **দেশপ্রেমিক ও ত্যাগীঃ**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি ত্যাগের মহিমা ও দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ, গৌরবে গৌরবান্বিত। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির প্রাণের প্রদীপ, বিদ্রোহের অগ্নিশিখা-বাংলা ও বাঙালির মুক্তির জন্যা তিনি দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। অবহেলিত, শোষিত বাঙালির মুক্তি আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ বঙ্গবন্ধু দুর্জয় সংকল্প স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতায় অবদমিত হননি। তিনি বারবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর জীবনের সুবর্ণ সময়গুলো অতিবাহিত হয়েছে পাকিস্তানি শোষকদের নির্জন, নিষ্ঠুর কারাগারের লৌহ কপাটের অন্তরালে।

১০. **ন্যায়পরায়ণ ও নির্লোভঃ**

বিচারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সত্যের ক্ষেত্রে সহজ ন্যায়ানুগ আর মিথ্যার ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর ও কঠিন। তিনি নিজে যেমন অন্যায় করতেন না, তেমটি অন্যায়কে পছন্দও করতেন না এবং প্রশ্রয়ও দিতেন না। তিনি ছিলেন নির্লোভ। ইচ্ছা করলেনই তিনি পাকিস্থানের শ্রেষ্ঠ ধনী ও সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হতে পারতেন। পাকিস্তানের গভর্নর বা প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা হননি। তিনি জনগণের সাথে ওয়াদা খেলাপ করননি।

১১. **সাধারণ জীবনযাপনকারীঃ**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনযাপন ছিল অতি সাধারণ। তাই দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকার পরও আধুনিক সাধ-সজ্জার সরকারি বাসভবণ 'গণভবন' -এর রাজকীয় জৌলসপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করে পরিবার পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেছিলেন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের ৬৭৭ নং সাদামাটা বাসভবনে এবং এখানেই থেকেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ঘরে ছিল সাধারণ মানের আসবাবপত্র।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ক্যারিশমাটিক নেতা এবং রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব হিসেবে একজন ব্যক্তির মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকার প্রয়োজন তার অনন্য সমাহার ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর মাঝে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯৭১ সালে মার্কিন সাপ্তাহিক মাগাজিন News Week -এ বঙ্গবন্ধুর ওপর Civil war in Pakistan শিরোনামে করা কভার স্টোরিতে তাকে `Poet of Politics` বা রাজনীতির কবি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। সাধারণ মানুষের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের অকৃত্রিম ভালোবাসা উপলব্ধি করে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ তাকে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় অভিহিত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণেই সমগ্র বাঙালি জাতি পাকিস্তানি

শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক কাতারে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তার রাজনৈতিক জীবন ছিল বহুল বর্ণিল, তার কণ্ঠে ছিল ইন্দ্রজাল; সেই ইন্দ্রজালিক শক্তিতেই তিনি ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে এক কাতারে সামিল করতে পেরেছিলেন। নির্ভীক ও স্বপ্নের কারিগর বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে নির্মাণ করেছিলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ও এর গৌরবদীপ্ত সাফল্যের ইতিহাস। একজন ক্যারিশমাটিক নেতা হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অনন্য নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির জনক । তার দূরদর্শী, বিচক্ষণতা এবং সঠিক নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তারআত্মত্যাগ ও ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব জাতিকে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তাই আজও তিনি দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে রয়েছেন। কবি অন্নদাশংকরের ভাষায় বলতে হয়–

"যতকাল রবে পদ্মা-যমুনা-গৌরী-মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

প্রশ্ন : Third Executive কী?

Third executive বলতে এনজিওকে বোঝায় ।

বর্তমানে এনজিওগুলোকে সরকারের Third executive বা তৃতীয় নির্বাহী শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আমলাদেরকে প্রথম নির্বাহী শাখা বলা হয়। তারা সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবার এনজিওগুলো তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করছে। এনজিওগুলো তাদের ভূমিকা ভিন্নভাবে পালন করছে। কখনো অংশীদার হিসেবে কাজ করে আবার কখনো বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে। এনজিওগুলোর বিশেষ সুবিধা হলো তৃণমূলে তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এনজিওগুলো উপলব্ধি করছে যে জাতীয় পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম বাড়াতে হলে সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এনজিওগুলোর কিছু অবদান সরকার-এনজিও সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করে। বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে যেখানে সরকার এবং এনজিওগুলি যে কোনও সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করে।কখনও কখনও এনজিওগুলি পরিকল্পনা তৈরিতে সরকারকে সহায়তা করে।

প্রশ্ন : শিক্ষায় ব্র্যাকের ভূমিকা সম্পর্কে লিখুন ।

০১. প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা:

বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু-শিক্ষার যে কার্যক্রম সরকারিভাবে চলছে, এর সূচনা আরও বহু আগেই করেছে ব্র্যাক। শিশুশিক্ষায় পিতা-মাতাকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা, নানারকম আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে পরিচিত করেছে ব্র্যাকের শিক্ষা মডেল।

০২. কারিগরি শিক্ষায় ভূমিকা:

২০১২ সালে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে স্কিল ট্রেনিং ফর অ্যাডভান্সিং রিসোর্সেস প্রোগ্রাম (স্টার) কার্যক্রম শুরু করে ব্র্যাক। এই কার্যক্রমের সঙ্গে ইউনিসেফ, আইএলও, এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো যুক্ত আছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির আওতায় এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১ লাখ ২০ হাজার তরুণ-তরুণীকে কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ব্র্যাক। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান, এই কার্যক্রমে শতকরা ৬০ ভাগ নারী বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন, যাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ শিক্ষার কোনও বিকল্প পথ ছিল না।

০৩. শিক্ষার সম্প্রসারণে ভূমিকা:

ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে উন্নত সমাজের বা ধনী পরিবারের সন্তানরা যে ধরনের শিক্ষার সুযোগ পায়, তাদের বিদ্যালয়ে, তিনি তেমন সুযোগগুলো গ্রামের সাধারণ পরিবারের শিশুদের জন্য দিতে চেয়েছেন। একসময় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা কেবল ধনী পরিবারের শিশুদের জন্য ছিল। ।

০৪. Play-Lab: আনন্দের সঙ্গে শেখা

আনন্দময় শিক্ষা শিশুদের পড়ালেখার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে- এই ভাবনার বাস্তব রূপ দিতেই ২০১৯ সালে BRAC Institute of Educational Development Play-Lab মডেলটি চালু করে। এখানে শিশুরা ছবি আঁকে, গান গায়, খেলতে খেলতে শেখে। দেশ-বিদেশে ব্র্যাক পরিচালিত ৬৬৫টি প্লে-ল্যাবে আনন্দময় শিক্ষার পাঠ নিচ্ছে ১১ হাজার ৫শ শিশু।

০৫. আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম:

অতিদরিদ্র পরিবারের ভঙ্গুর অবস্থা ও প্রয়োজন নিবিড়ভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে তাদেরকে দারিদ্র্যজয়ে সহায়তা করছে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ব্র্যাকের Ultra-Poor Graduation Program (EPGG). ব্র্যাকের EPGG ২০০২ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। এখন পর্যন্ত এই প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে ৪৮ জেলায় ২২ লাখের বেশি পরিবার টেকসইভাবে অতিদারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। London School of Economics and Political Science এর গবেষণায় দেখা গেছে, গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ৯৩% সদস্য সাত বছর পরও উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন। বাংলাদেশে এই প্রোগ্রামের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে এই গ্র্যাজুয়েশন মডেল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অতিদারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের সরকার, বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীদার গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে, যা শুধু ব্র্যাক নয়, পুরো বাংলাদেশের জন্যই গর্বের।

০৬. নারী শিক্ষায় ব্র্যাকের অবদান:

নারী শিক্ষা বা কন্যাশিশুর শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ব্র্যাকের স্কুলগুলোতে ৭০ শতাংশ কন্যাশিশু ভর্তির লক্ষ্য নেয়া হয়। আর শিক্ষক হিসেবেও প্রাধান্য পায় নারীরা।